জীবন-জীবিকায়নে

ক্ষুদ্রঋণ

জুন ২০২৩

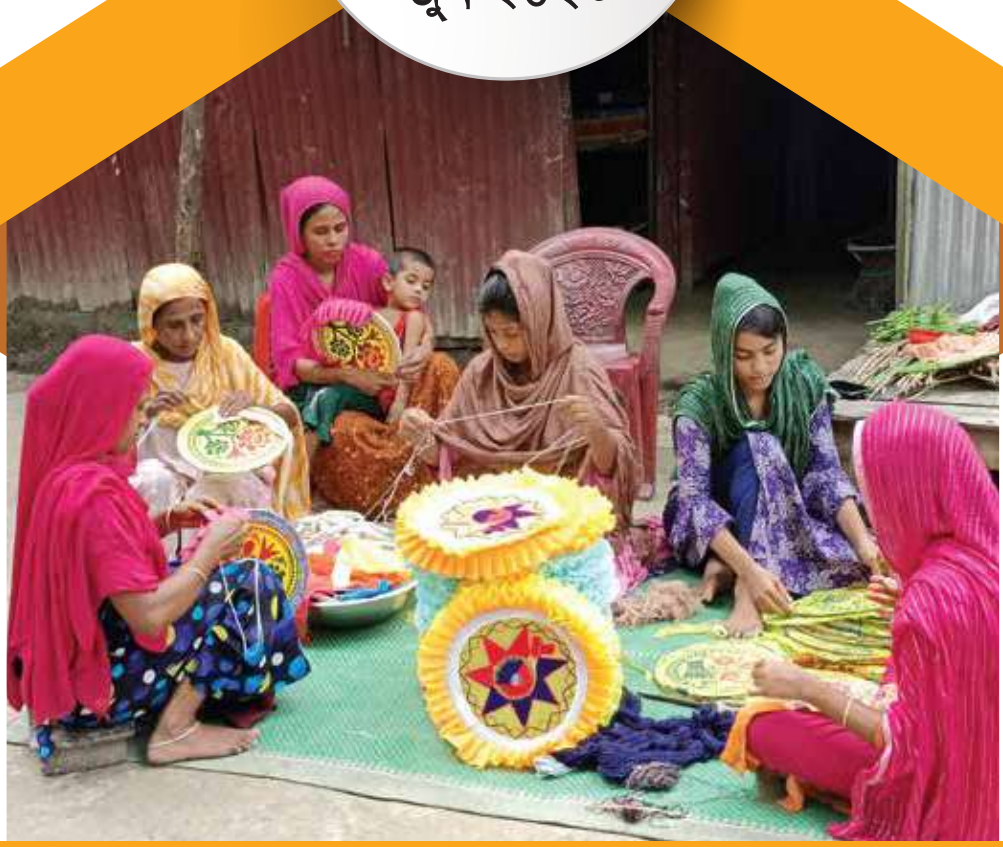

ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)

জুন ২০২৩

জীবন-জীবিকায়নে ক্ষুদ্রঋণ

ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)
বাড়ি নং- ৮৫২, রোড নং- ১৩, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি
আদাবর, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল: ০১৮১১-৪৮০০০৬, ০১৮১১-৪৮০০১১
ই-মেইল: dfed@ahsaniamission.org.bd
http://www.dfed.org.bd

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের উপকারভোগীদের সাফল্যগাঁথা সম্বলিত কিছু কেস স্টাডি

প্রকাশকাল: ২০২৩ (৪র্থ সংখ্যা)

প্রকাশনায়
ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)
বাড়ি নং- ৮৫২, রোড নং- ১৩, বাইতুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, ঢাকা-১২০৭

উপদেষ্টা
মো. সাজেদুল কাইয়ুম দুলাল

সম্পাদক
মো. আসাদুজ্জামান

নির্বাহী সম্পাদক
মো. আব্দুর রাজ্জাক
খো. মো. আব্দুন নাঈম

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
মো. আমিনুল হক

মুদ্রণ
প্রাইম আর্ট প্রেস লি.
৪৯/১, পুরানা পল্টন লেন, ঢাকা-১০০০।

ISBN Number: 978-984-35-4713-2

পাঠকের জন্য দ্রষ্টব্য

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সাল থেকে ক্ষুদ্রঋণ বাস্তবায়ন করছে। সময়ের পরিক্রমায় মিশনের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম একটি টেকসই ও মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছে। ক্ষুদ্রঋণকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন 'ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)' নামে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছে যা মিশনের একটি সামাজিক উদ্যোগ হিসেবে জুন ২০১৪ থেকে যাত্রা শুরু করে। তাই ডিএফইডি কতৃক প্রকাশিত জীবন-জীবিকায়নে ক্ষুদ্রঋণ সংকলনে উল্লেখিত কেস স্টাডিসমূহ মিশনের সার্বিক কার্যক্রমের প্রতিফলন হিসেবে বিবেচিত হবে।

সূচীপত্র

১০ হাজার টাকায় বদলে গেছে রিনার জীবন ০৯

ক্ষুদ্রঋণে সফল শাহাবুদ্দীন মিজির জীবনের গল্প ১১

হাত পাখায় ফিরেছে বিলকিসের ভাগ্য ১৩

লেয়ার মুরগীতে স্বাবলম্বী মনোয়ারা ১৫

কর্মী থেকে সফল উদ্যোক্তা চট্টগ্রামের মজিবুর ১৭

কোয়েল চাষে ভাগ্য বদলেছে ইলা রাণীর ১৯

মাল্টা চাষে সুদিন ফিরেছে নাসরিন খাতুনের ২১

নাহিদার খামারে এখন ৪০টি ছাগল ও ১০টি গরু ২৩

ট্রাউজারে ব্যবসায় ভাগ্য বদল খুসু বেগমের পরিবারের ২৫

ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে উদ্যোক্তা হলেন খালেদা ২৭

মাছ চাষ করে স্বাবলম্বী মো. সাদেকুর রহমান ২৯

ছোনিয়া আক্তারের কাঁকড়া চাষের সফল কাহিনী ৩১

শুভেচ্ছা বানী

কাজী রফিকুল আলম
চীফ এডভাইজর

ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি প্রাতিষ্ঠান হিসেবে দেশের দারিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করে আসছে। ডিএফইডি'র সাথে সম্পৃক্ত অতি সাধারণ, অবহেলিত জনগোষ্ঠীর সাফল্যগাঁথা 'জীবন-জীবিকায়নে ক্ষুদ্রঋণ' সংকলনটির ৪র্থ সংখ্যা প্রকাশ করা হবে জেনে আমি আনন্দিত। তাদের এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে তাদের সঠিক পরিকল্পনা ও পরিশ্রম, সেইসাথে ডিএফইডির আর্থিক সহযোগিতা।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে দেশের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে এনজিওগুলোর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। আনন্দের বিষয় যে, এসকল হতদরিদ্র শ্রেণির সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের সফলতার খবর যখন দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তখন তাদের সাথে আমিও আনন্দিত হই। আরও ভালোলাগার বিষয় হচ্ছে ঐসকল দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিজেদের উন্নয়ন তথা কর্মসংস্থানের পাশাপাশি আরও অনেকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ডিএফইডি ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের সমাজসেবামূলক কার্যক্রমের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। ভিক্ষুক পুনর্বাসন থেকে শুরু করে শিক্ষা উপবৃত্তি, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা, কিশোর-কিশোরীর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তা ও বেকার যুবকদের বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ডিএফইডিকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। আমি ডিএফইডি'র সার্বিক সাফল্য এবং যাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানটি এগিয়ে যাচ্ছে আমি তাদের মঙ্গল কামনা করছি।

কাজী রফিকুল আলম
চীফ এডভাইজর

শুভেচ্ছা বাণী

অধ্যাপক ড. আবু তৈয়ব আবু আহমদ
চেয়ারপার্সন

ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নানান উদ্ভাবনীমূলক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাফল্য নিয়ে 'জীবন-জীবিকায়নে ক্ষুদ্রঋণ' সংকলনটির ৪র্থ সংখ্যা প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত।

ডিএফইডির ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের পরিসর দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে উদ্যোক্তা তৈরির সক্ষমতা। উদ্যোক্তাগণ ডিএফইডি'র ওপর আস্থা রেখে তাদের ব্যবসায়িক বিনিয়োগ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে চলেছে জেনে আমি আনন্দিত। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ভিক্ষুকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার যে লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করেছে, ডিএফইডি এই অগ্রযাত্রায় অংশগ্রহণ করে অনেক ভিক্ষুককে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তায় উন্নীত করেছে তাদের মধ্যে একজন উদ্যোক্তার সফলতা এই সংকলনটিতে স্থান পেয়েছে। আমি চাই প্রতিটি ভিক্ষুক ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে স্বাভাবিক পেশায় নিয়োজিত হোক। ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে স্বচ্ছল বাংলাদেশ গড়ে উঠুক।

এই প্রকাশনাটিতে ডিএফইডি'র উদ্যোক্তাদের সাফল্যগাঁথা জীবনী সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এ ছাড়াও এই প্রকাশনাটি ডিএফইডি'র ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের বৈচিত্র্যময় দিকগুলো পাঠকের কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। 'জীবন-জীবিকায়নে ক্ষুদ্রঋণ' শীর্ষক প্রকাশনাটি আমাদের দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে এ ধরণের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় উৎসাহিত করবে বলে আমি আশা করি।

প্রকাশনাটিকে তথ্যবহুল ও সমৃদ্ধ করার জন্য ডিএফইডি'র যেসকল কর্মকর্তা কাজ করেছেন তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির সকল পর্যায়ের কর্মীদেরকে তাদের কঠোর পরিশ্রম ও আন্তরিকতার জন্য জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

অধ্যাপক ড. আবু তৈয়ব আবু আহমদ
চেয়ারপার্সন

শুভেচ্ছা বাণী

অধ্যাপক ড. কাজী শরিফুল আলম
ভাইস চেয়ারপার্সন

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও জুন ২০২৩ মাসে ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির সদস্যদের সাফল্যের জীবনগাঁথা সম্বলিত একটি বুকলেট প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি প্রতিষ্ঠান ডিএফইডি ১৯৯৩ সাল থেকে ক্ষুদ্রঋণ বাস্তবায়নের পর থেকে বর্তমানে প্রায় দেশের ৩২টি জেলায় কার্যক্রম চলমান রেখেছে। বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণের কার্যক্রম ১৯৭২ সাল থেকে বিরাজমান। প্রথম দিকে এত প্রসারতা না হলেও সময়ের বিবর্তনে আস্তে আস্তে প্রসারতা লাভ করে। ডিএফইডি বিভিন্ন সামাজিক বিষয়গুলো বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়ন, প্রযুক্তিগত সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও সুশাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

ডিএফইডি প্রায় তিন দশক ধরে দেশের বিভিন্ন এলাকায় কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। দেশের প্রত্যন্ত এলাকার অতি সাধারণ সুবিধাভোগী সদস্যদের সাফল্যের চিত্র কখনো কোনোভাবেই বাংলাদেশের গণমাধ্যম কিংবা পত্র-পত্রিকা স্বপ্রণোদিত হয়ে প্রকাশ করে না। ডিএফইডি উক্ত অবহেলিত সদস্যদের সাফল্যের গল্প প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এমন সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন ধরণের উৎপাদনমুখী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তাদের নিজেদের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছে। ডিএফইডি ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের সামাজিক কার্যক্রমের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করে আসছে।

আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভকামনা জানাই যারা ডিএফইডি'র কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছেন।

অধ্যাপক ড. কাজী শরিফুল আলম
ভাইস চেয়ারপার্সন

মুখবন্ধ

মো. সাজেদুল কাইয়ূম দুলাল
সেক্রেটারী জেনারেল

ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) ২০২৩ সালে সফলতার সঙ্গে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে ৩০ বছর পূর্ণ করেছে।

১৯৯৩ সাল থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন এবং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দারিদ্র্যহ্রাসের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এ কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য 'ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)' শীর্ষক একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে যা মিশনের একটি সামাজিক উদ্যোগ হিসেবে জুন ২০১৪ থেকে যাত্রা শুরু করেছে।

ডিএফইডি সমাজের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করে কৃষি বহুমুখীকরণ, উৎপাদনমুখী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন, মার্কেট লিংকেজ ডিমান্ড, সংশ্লিষ্ট বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করে যাচ্ছে।

দরিদ্র পরিবার ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে সময়ের ব্যপ্ত পরিসরে যে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠেছে গণমাধ্যমে সবসময়ে তা সঠিকভাবে উঠে আসে না। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে যে অবদান রাখছে তা বৃহত্তর পরিসরে তুলে ধরার জন্য ডিএফইডি জানুয়ারি ২০২৩ সালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের জনসংযোগ বিভাগের সহায়তায় দেশের শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যমগুলোর সমন্বয়ে একটি মিডিয়া ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে। এর আওতায় বিভিন্ন গণমাধ্যম কর্মীরা ডিএফইডি'র ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে ফিচার প্রতিবেদন তৈরি করে যা উল্লেখিত সময়ে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এর মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক সৃজনশীল কার্যক্রম এবং ক্ষুদ্রশিল্প উদ্যোগসমূহে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সফলতার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে এ ফিচার প্রতিবেদনগুলো বিবেচিত হবে যা অন্যদের এরূপ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।

প্রকাশিত ফিচার প্রতিবেদনগুলো সমন্বিত করে এই সংকলনটি প্রকাশ করা হচ্ছে। সংকলনটি প্রকাশের জন্য যেসকল গণমাধ্যমকর্মী ডিএফইডি'র মাঠ পর্যায়ের বাস্তব কাহিনীসমূহ সংগ্রহ ও জাতীয় পর্যায়ের গণমাধ্যমে প্রকাশ করেছেন এবং ডিএফইডি'র যেসকল কর্মকর্তা সংকলনটি প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মো. সাজেদুল কাইয়ূম দুলাল
সেক্রেটারী জেনারেল

শুভেচ্ছা বানী

ইঞ্জি. এ.এফ.এম গোলাম শরফুদ্দিন
ট্রেজারার

ডাম ফাউন্ডেশন ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) দেশের দারিদ্র্যপীড়িত সাধারণ মানুষের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে প্রায় তিন দশক ধরে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করে আসছে। প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও ক্ষুদ্রঋণ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সুবিধাভোগীদের সাফল্যমণ্ডিত জীবনগাঁথা নিয়ে একটি তথ্যসম্বলিত বুকলেট প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এসকল ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের জীবনী, তাদের দুঃখভরা জীবনের কথা ও জীবনের এমন দৃশ্যমান সাফল্য আজ আমরা সহজে অনুধাবন করতে পারছি। অনেক বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে আজ তারা এই সমাজের সফল উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিতি।

বর্তমানে ডিএফইডি দেশের ৩২টি জেলার ১৩৯টি উপজেলায় ২,৪৭,০০০ সুবিধাভোগী নিয়ে কাজ করছে। ব্যাংক, পিকেএসএফ ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ডিএফইডি'র আর্থিক সহযোগী হিসেবে সহযোগিতা করে আসছে। সফল উদ্যোক্তার কারণে দেশের উন্নয়নে দিন দিন তাদের অবদান বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির দক্ষ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ইউনিটের প্রায় ১১০০ কর্মী কাজ করছে।

আমি তাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই, যারা এই চ্যালেঞ্জিং কাজগুলো খুব সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেছেন এবং কর্মসূচির বিভিন্ন স্তরে এর যাত্রা সফল করতে অবদান রেখেছেন। আমি বিশ্বাস করি বুকলেটটি অন্যদের অনুপ্রাণিত করবে।

আমি সকলের সফলতা কামনা করছি এবং প্রতিষ্ঠানটি একদিন দেশের সকল দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় কাজ করবে- এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

ইঞ্জি. এ.এফ.এম গোলাম শরফুদ্দিন
ট্রেজারার

১০ হাজার টাকায় বদলে গেছে রিনার জীবন

জয়নাল আবেদীন শিশির

১৯৯৭ সালে যশোর চৌগাছা উপজেলার পাতিবিলা গ্রামের রিক্সাচালক আজগর আলীর সাথে বিয়ে হয় রিনা বেগমের। বিয়ের পর থেকেই সংসারে অভাবের শেষ নেই। তারপর তিন-তিনজন সন্তান নিয়ে পরিবারে দিনে দু'বেলা খাবার যোগাতেও কষ্ট হতো, কিন্তু সেই রিনা বেগম ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পেয়ারা চাষ করেন। মাত্র এক দশকের মাথায় আজ স্বাবলম্বী। যার রয়েছে এখন ২০-২৫ লাখ টাকার অর্জিত সম্পদ, ৩-৪ বিঘা পেয়ারার বাগান, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগীর পাল।

রিনা বেগমের সাথে কথা বলার সময় তিনি জানান, সংসারের অভাব-অনটন দেখে দিশেহারা হয়ে পাতিবিলা গ্রামে আহ্ছানিয়া মিশনের ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)-এর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির দারস্থ হন। এলাকাতেই চলমান আছে কোকিল দল নং- ০৫৮। স্বামীর সাথে কথা বলে উক্ত দলে সদস্য হয়ে সঞ্চয় জমা শুরু করেন এবং ১৫ দিন পর ১০ হাজার টাকা ঋণ নেন। ২০১০ সালে সেই ঋণের টাকা দিয়ে সামান্য একটু জমি লীজ নিয়ে রিনা শুরু করেন ব্যাণিজ্যিকভাবে পেয়ারা চাষ। সেই থেকে আর রিনা বেগমকে পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। বর্তমান ১১০ শতক জমিতে পেয়ারা চাষ করেন। হাঁসি ফুটতে থাকে তার অভাবের সংসারে। রিনা বেগমের দুই ছেলে, স্বামীসহ তিনজন কর্মচারী নিয়ে কাজ করেন তার পেয়ারা বাগানে। ভালো স্কুলে পড়াশোনা করে তার একমাত্র মেয়ে তহুফা। স্বামী-সন্তান নিয়ে তার এখন সুখের সংসার।

রিনা বেগম জানান, উক্ত পেয়ারা বাগানে পেয়ারার পাশাপাশি হলদি, ক্ষীরা ইত্যাদি চাষ করছেন। উৎপাদিত ফসলের আয় দিয়ে তিনি ইতোমধ্যে কিনেছেন ১০ শতক জমি, যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ১০ লাখ টাকা। বর্তমানে ব্যবসায়ে তার রয়েছে প্রায় ১৫ লাখ টাকার মূলধন এবং ১২টি ছাগল, ২টি গরুসহ বাড়িতে হাঁস-মুরগির খামার।

তিনি আরও জানান, আমার স্বামীর মাঠে চাষ করার মতো জমি ছিল না। রিক্সা চালানো, দিনমজুর বা অন্যের জমিতে কামলা দিয়ে কোনোমতে সংসার চালাতেন, কিন্তু তিন সন্তানসহ পাঁচজনের সংসার চালানো সম্ভব হচ্ছিলনা

এই সামান্য আয়ে। তাই বাধ্য হয়ে ডিএফইডি থেকে প্রথমে ১০ হাজার টাকা ঋণ নেই, সেই টাকা দিয়ে বাড়ির পাশে সামান্য একটু জমি লিজ নিয়ে পোয়ারার চাষ করে আস্তে আস্তে সংসারের অভাব দূর করতে থাকি। পরে এই জমির আয় থেকে ঋণ শোধ করে সেই আয়ের বাকিটুকু দিয়ে আরও বেশি জমি লিজ নেই। তারপর থেকে আমি এই উদ্যোগে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠি।

রিনা বেগম পরবর্তীতে ডিএফইডি থেকে বিনিয়োগের জন্য ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন। তার দেখাদেখি একই গ্রামের অন্তত ৩০ জন নারী ঋণ নিয়ে আজ তারাও পেয়ারা চাষ ও ড্রাগন ফল চাষ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বা সরকারের এসএমই ফাউন্ডেশন থেকে কোনো ধরণের সহযোগিতা কখনো পেয়েছেন কিনা– এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত সরকারি কোনো ধরণের সহযোগিতা পাইনি। যদি সরকারি সামান্যও সহযোগিতা পাই, তাহলে আগামী ৮-১০ বছরের মাধ্যমে আমার চাষাবাদ ৭-৮ গুণ বৃদ্ধি পাবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস রাখি।

উৎপাদিত ফসলের আয় দিয়ে তিনি ইতোমধ্যে কিনেছেন ১০ শতক জমি, যার বর্তমান বাজার মূল্য রয়েছে প্রায় ১০ লাখ টাকা, বর্তমানে ব্যবসায়ে তার রয়েছে প্রায় ১৫ লাখ টাকার মূলধন এবং ১২ টি ছাগল, ২টি গরুসহ বাড়িতে হাস-মুরগির খামার

আহ্ছানিয়া মিশন বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ের একটি শীর্ষস্থানীয় বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা। উপমহাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক এবং প্রখ্যাত সূফীসাধক হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ১৯৫৮ সালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সাধারণ মানুষ বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও আত্মিক জীবন উন্নয়নে বিভিন্নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে এবং তাদের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রতিষ্ঠানটির অনেকগুলো কার্যক্রমের মধ্যে স্বল্প ও নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করে 'ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)'। প্রতিষ্ঠানটির তথ্যমতে, এ পর্যন্ত ৩৪,৪৯০,৮৯৭,০০০ টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১,১১৬,৬৮৫ জন মানুষের মধ্যে। গতবছর (২১-২২ অর্থবছর) বিতরণ করা হয়েছে ১৪৬,৬৮৫ জনের মধ্যে।

২০১০ সালে রিনা বেগমকে ঋণ দেন যশোর চৌগাছা উপজেলার ডিএফইডি'র শাখা ম্যানেজার জামাল উদ্দীন। তিনি বলেন, রিনা বেগম যখন ১০ হাজার টাকা ঋণ নেন, তখন তার অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল, কোনোমতে দিনানিপাত করতেন। তিনি যখন আমাদের কাছে ঋণের জন্য আসেন তখন তিনি ৩০ হাজার টাকার ঋণ প্রস্তাব করেন। কিন্তু তার পরিবারের অভাব-অনটন দেখে আমরা মাত্র ১০ হাজার টাকা ঋণ দেই। কিন্তু বর্তমানে রিনা বেগম এই এলাকায় একজন অনুকরণীয় সফল উদ্যোক্তা।

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় প্রকাশিত

ক্ষুদ্রঋণে সফল শাহাবুদ্দীন মিজির জীবনের গল্প

মরিয়ম সেঁজুতি

মো. সাহাবুদ্দিন মিজি। হতাশা আর অন্ধকার থেকে ঘুরে দাঁড়ানো এক যোদ্ধার নাম। মুন্সীগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার নয়াগাঁও গ্রামের ৬৪ বছর বয়সী সাহাবুদ্দিন মিজি শুন্য থেকে শুরু করে বর্তমানে প্রতিমাসে ৬০-৬৫ হাজার টাকা আয় করছেন। নিজের হারানো ভিটে-বাড়ি ফিরে পাওয়ার স্বপ্নও দেখছেন।

জীবনের শুরুতে ভালই চলছিল। ছিল পারিবারিক সূত্রে পাওয়া সুতার মিল ও সুতার ব্যবসা। মাত্র ১৯ বছর বয়সে বিয়ে করেন ১৪ বছর বয়সী রাসিদা বেগমকে। দুই ছেলে আর এক মেয়ে নিয়ে সংসারটা সুখেরই ছিল। ছিল পরিশ্রমী জীবন আর সংগ্রামী মানসিকতা। পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া জমিতে একটি চৌচালা আধা-পাকা ঘরও ছিল। বাবার দেয়া ব্যবসাকে নিজের পরিশ্রম আর মেধা দিয়ে আরও বড় করে তুলেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তার চলার পথে বড় এক বাধা এসে দাঁড়ায়। ২০১৬ সালে স্ত্রী রাশিদা বেগমের পেটে টিউমার ধরা পড়ে। চিকিৎসা খরচ মেটাতে দুই শতক জমিতে থাকা চৌচালা বাড়িটি বিক্রি করে দিতে হয় সাহাবুদ্দিন মিজিকে। এক সময় গোয়ালের গরু, এমনকি ভিটেমাটি বিক্রি করেও শেষ রক্ষা হয় না। বাঁচাতে পারে না স্ত্রীকে। সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে আড়াই বছরের চিকিৎসা শেষে স্ত্রী রাসিদা বেগমের মৃত্যু হয়। দেশে-বিদেশে মিলিয়ে চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে ব্যবসার পুঁজি তো হারালেনই, হারালেন বাড়ি, এমনকি জমিও। দেনার দায়ে সুতার ব্যবসাও বন্ধ হয়ে যায়। বাল্যবন্ধু রফিকের বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয় তাকে। বড় ছেলে বিয়ে করে শ্বশুরবাড়িতে থাকে। বাবার কোন খোঁজ-খবর রাখে না। অভাবের কারণে একমাত্র মেয়েকে ১৪ বছর বয়সেই বিয়ে দেয়া হয়।

সবকিছু হারিয়ে দিশেহারা সাহাবুদ্দিন নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখেন। ধার দেনা করে ছোট ছেলে সাইফুলকে তিন লাখ টাকা খরচ দিয়ে দুবাই পাঠিয়ে দেন। কিন্তু বৈশ্বিক মহামারি করোনার প্রভাবে চাকরিহারা হয়ে দেশে ফিরে আসে সাইফুল। এরপর শুরু হয় আরেক জীবনযুদ্ধ। প্রতিনিয়ত পাওনাদারদের আতঙ্কে থাকতে হতো বাবা-ছেলেকে। হতাশা ভর করতে থাকে তার মধ্যে। ভাবলেন, এ জীবন রেখে লাভ কী। এমন সময় চাচাতো বোন তাকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরুর কথা বললেন। কিন্তু এমন নিঃস্ব ব্যক্তি কোথায় ঋণ পাবে-তাই নিয়ে ভাবনা। শুরু

করলেন ভাড়ায় মিশুক চালানো। বাবাছেলে মিশুক চালিয়ে যা আয় করেন তা দিয়ে দেনা পরিশোধ পরের কথা, থাকা-খাওয়াই হয় না। কারণ একটা মিশুক দিয়ে দিনে ৭০০-৮০০ টাকা আয় করা সম্ভব হলেও দিনশেষে মিশুক ভাড়া বাবদ দিতে হয় ৩৫০ টাকা। শাহাবুদ্দীন মিজির চাচাতো বোন ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে নিজেই একটা মিশুক কিনে চালাতে বললেন।

মুন্সীগঞ্জ শহরে যেহেতু সরাসরি পরিবহন (বড় গাড়ী) চলাচল নেই সেহেতু স্থানীয় যাতায়াতের জন্য মিশুক-সিএনজি'র রয়েছে প্রচুর চাহিদা। মিশুক চালানোই হচ্ছে মুন্সীগঞ্জের অন্যতম সহজ পেশা। চাচাতো বোনের পরামর্শ নিয়ে সাহাবুদ্দিন মিজি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠান- ডিএফইডির মুন্সীগঞ্জ সদর ব্রাঞ্চে যোগাযোগ করেন। নিয়মমাফিক যাচাই-বাচাই করে ডিএফইডি মুন্সীগঞ্জ সদর ব্রাঞ্চ সমাজপতির জিম্মায় বাই মুয়াজ্জল পদ্ধতিতে ৮০ হাজার টাকায় কিনে দেন একটা নতুন মিশুক গাড়ি। শাহাবুদ্দীন মিজির ছোট ছেলে সাইফুল তখনও ভাড়ায় মিশুক চালায়।

ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে সাহাবুদ্দিনের ভাগ্যের চাকা। এক বছরের মধ্যে ধারদেনা প্রায় পরিশোধ করে ফেলেন তিনি। নিয়মমাফিক পরিশোধ হয়েছে ডিএফইডি'র মিশুকের ঋণও। প্রথমবারের দেনা পরিশোধ করে দ্বিতীয় দফায় আবারও ডিএফইডি থেকে এক লাখ টাকায় কিনেন নতুন আরেকটি মিশুক এবং নিজের পুরাতন মিশুকের জন্য নতুন ব্যাটারী। এরপর আর পিছনে তাকাতে হয়নি শাহাবুদ্দীন মিজিকে। গত দুই বছরের উপার্জন দিয়ে কিনেছেন আরও ছয়টি মিশুক। স্থানীয় বাজারের মোড়ে দোকান ভাড়া নিয়ে করেছেন মিশুক-সিএনজি মেরামত সেন্টার এবং মিশুকের গ্যারেজ। যেখানে প্রতিদিন ৪৫-৫০টি মিশুকের চার্জ দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। পুরাতন মিশুক কেনা-বেঁচার ব্যবসাও আছে। এখন মাসে ৬০-৬৫ হাজার টাকার বেশি আয় হচ্ছে। স্বপ্ন দেখছেন নিজের জায়গায় একটি বাড়ি তৈরির।

অভাব জয় করে স্বপ্ন দেখছেন একখণ্ড জমি ও একটি স্বপ্নের বাড়ির

তিনি বলেন, ব্যাংক বা কোনো জায়গায় ঋণ নিতে গেলেই সম্পদ দেখাতে হয়। কিন্তু যার কিছুই নেই সে কীভাবে সম্পদ দেখাবে? আশেপাশের ২/১টা এনজিওর কাছে ঋণের জন্য ধরনা দিয়েও সাড়া পাইনি। সবাই ভেবেছে, আমি হয়তো টাকা নিয়ে পালিয়ে যাবো। কিন্তু এখানে আমার বাপ-দাদার কবর। স্ত্রীর কবর। এসব রেখে কোথায় যাবো? সেদিক থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ডিএফইডি'র মুন্সীগঞ্জ সদর ব্রাঞ্চের স্যার অনেক ভালো। আমাকে প্রথমেই ৮০ হাজার টাকা দিয়ে একটা নতুন মিশুক গাড়ি কিনে দেন। প্রথমবারের টাকা প্রায় শোধ হয়েছে। এবারে ডিএফইডি থেকে এক লাখ টাকায় কিনেছি নতুন আরেকটি মিশুক এবং নিজের পুরাতন মিশুকটার জন্য নতুন ব্যাটারী।

এভাবেই ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে নিজের অভাব ঘুচিয়েছেন সাহাবুদ্দিন মিজি। স্বপ্ন দেখছেন আবারো একখণ্ড নিজের জমি, একটা নিজের বাড়ির।

২৮ জানুয়ারি ২০২৩, দৈনিক ভোরের কাগজ পত্রিকায় প্রকাশিত

হাত পাখায় ফিরেছে বিলকিসের ভাগ্য

রাশেদ রাব্বি

গ্রামের নাম মূখী। ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার অন্তর্গত এই গ্রাম। এখানকার সব মানুষের জীবিকার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে 'হাত পাখা'। গ্রামের প্রতিটি ঘরেই তৈরি হয় বাঁশ ও কাপড়ের পাখা। সুই-সুতোয় গাঁথা নকশি পাখা, স্ক্রিন প্রিন্টে ছাপানো রঙিন কাপড়ের পাখা। এই পাখার শীতল বাতাস যেমন অনেকে প্রাণ জুড়ান, তেমনি ফিরেছে মূখী গ্রামের মানুষের ভাগ্য।

এই বিষয়ে কথা হয়, বিলকিস বেগমের সাথে। এক সময় ভাগ্য বিড়ম্বিত জীবন-যাপন করলেও পাখা তৈরি করে ফিরেছে তার ভাগ্য। এখন তিনি স্বাবলম্বী, জীবন-যাপানে স্বচ্ছলতার ছাপ। বিলকিস জানান, বছর দুয়েক আগেও তার আর্থিক অবস্থা এমন ছিল না। বেঁচে থাকার জন্য স্বামী, সন্তান নিয়ে ঢাকায় কাজ করেছেন। কিন্তু দুজনে মিলে আয় করেও চলতে পারতেন না। তবে হাত পাখা বানানোর কাজ শিখেছিলেন শৈশবে। শেষ পর্যন্ত সেই পাখাতে ভর করেছে জীবনের চাকা। এক বছরে প্রায় তিন লাখ পাখা উৎপাদন ও বিক্রি করেন তিনি। এই কাজে তাকে সহায়তা করছে আরো দশ জন নারী। যারা প্রতিদিন গড়ে এক হাজার পাখা তৈরি করেন। এতে করে মাসে প্রায় ত্রিশ হাজার পাখা তৈরি হয় তার উঠানে। সিলেট, কিশোরগঞ্জ, ফরিদপুর, বরিশালের ব্যবসায়ীরা তার বাড়ি থেকে পিকাপ ভর্তি করে নিয়ে যায় পাখা।

বিলকিস জানান, হাতল ছাড়া একটি পাখা তিনি বিক্রি করেন ২৫ থেকে ৫০ টাকায়। পাখার হাতলগুলো আলাদা বিক্রি হয় শ' হিসেবে। রং বেরংয়ে কাপড়ের ওপর নানা বর্ণের সুতোয় নকশা করা পাখাগুলো বিক্রি হয় গড়ে ৫০ টাকায়। বিশেষ নকশার পাখা হলে সেগুলোর দাম পড়ে ৬০ টাকা। অন্যদিকে কাপড়ের ওপর স্ক্রিন প্রিন্টের ডিজাইনের পাখাগুলো বিক্রি ২০ থেকে ২৫ টাকায়। একশ পাখা তৈরির মজুরি হিসেবে একজন কর্মী পান ৮০০ টাকা। তার দশজন কর্মী এভাবে পাখা তৈরি করে মাসে আয় করেন ২০ থেকে ২৪ হাজার টাকা। যেখানে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে একজন গার্মেন্টস কর্মী বেতন পান মাত্র ৮ থেকে ১২ হাজার টাকা।

বিলকিস জানান, মাত্র দু'বছর আগেও তিনি একাই পাখা তৈরি করতেন। টাকার অভাবে ব্যবসায়ীদের অর্ডার

নিতে পারতেন না। এমন সময় তার পাশে দাঁড়ায় ডিএফইডি। ২০২১ সালের মার্চে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হন। পরে এখান থেকে ৩০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে পাখার ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন। এতেই ঘুরতে শুরু করে তার ভাগ্যের চাকা। এই টাকা পরিশোধ করে তিনি ডিএফইডি থেকে এক লাখ টাকা ঋণ সুবিধা পান। তারপর আর তাকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। সেই টাকা দিয়ে স্কিন প্রিন্টের একটি সেট কিনেছেন। নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদীর কাপড়ের বাজার থেকে স্বল্প দামে কিনে এনেছেন এক বছরের পাখা তৈরির কাপড়। আগে পাখার কাঠামো তৈরির বাঁশ কিনতেন একটি দু'টি করে। কিন্তু এবার তিনি পুরো একটি বাঁশ বাগান কিনে রেখেছেন। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহেও তিনি প্রায় পাঁচ হাজার পাখা বিক্রি করেছেন। এখনও চলছে অর্ডারের কাজ। চরমোনাই পীরের স্লোগান সম্বলিত ১০ হাজার পাখা তৈরির কাজ চলছে। বিলকিসের বাড়িতে পাখা তৈরি যেন একটি উৎসব। তার দশ বছরের প্রতিবন্ধী মেয়েও প্রতিদিন সবার সাথে বসে পাখা বানায়। ছেলেকে ভর্তি করিয়েছেন স্কুলে।

এখন তার স্বপ্ন বাড়িটি পাকা করবেন, বাড়াবেন ধানী জমির পরিমানও, পাখার কাঁচামাল আনানেওয়া করতে কিনবেন একটি পিকআপ

বিলকিস বলেন, আগে তার স্বামী দিন মজুরের কাজ করতেন। এখন পাখা তৈরিতে সাহায্য করেন। পাখা বিক্রির টাকা দিয়ে গরু কিনেছেন। টিনের ঘর তুলেছেন তিনটি। একটিতে নিজেরা থাকেন একটি পাখার সরঞ্জাম রাখা হয়, অরেকটি গরু রাখার জন্য। বিনোদনের জন্য কিনেছেন ৫০ ইঞ্চি স্মার্ট টিভি। খাবার সংরক্ষণের জন্য আছে ফ্রিজ। এখন তার স্বপ্ন বাড়িটি পাকা করবেন, বাড়াবেন ধানী জমির পরিমানও, পাখার কাঁচামাল আনা নেওয়া করতে কিনবেন একটি পিকাপ।

কথা হয় বিলকিসের পাখা কর্মী রিমা, পাপিয়া, লাভলী, হাসি ও লাকির সঙ্গে। তারা জানান, পাখার কাজ করে তারাও স্বাবলম্বী। এক সময় গার্মেন্টেসে সকাল সন্ধা কাজ করতেন সাত থেকে আট হাজার টাকার জন্য। এখন সকালে নাস্তা করে পাখা তৈরি শুরু করেন, দুপুরে বাড়িতে গিয়ে রান্না-বান্না করেন, সন্তানের দেখভাল করে আবার বিকেলে এসে পাখা বানান। এতেই তারা মাসে ২০ হাজার টাকা বেশি রোজগার করেন। তারা ভালো আছেন।

ময়মনসিংহের ভালুকা বাস স্ট্যান্ড থেকে পূর্ব-পশ্চিমে যে সড়কটি চলে গেছে সেটি ধরে কিছুটা এগোলেই মূখী গ্রাম। গ্রামের শান্ত সুনিবিড় ছায়া-শীতল পথ ধরে চলতেই দেখা হয় মোরশেদ আলীর সঙ্গে। তিনিও এই গ্রামের বাসিন্দা। মোরশেদ জানান, এই গ্রামের প্রায় চল্লিশটি ঘরে পাখা তৈরি হয়। এই গ্রামেই বছরে তৈরি হয় ১০ থেকে ১২ লাখ পাখা। যেগুলো পৌঁছে যায় ঢাকা, সিলেট, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশালের গ্রামে-গঞ্জে, মানুষের হাতে হাতে।

গ্রামবাসী জানান, গ্রীষ্মকাল ছাড়াও আশ্বিন, কার্তিক, চৈত্রসহ কয়েক মাসে প্রচণ্ড দাবদাহ এবং ভ্যাপসা গরম পড়ে। গরমের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কর্মচাঞ্চল্যও বাড়ে 'মূখী' গ্রামের মানুষদের। এ সময় বাঁশের ফ্রেমের ওপর নকশি কাপড় দিয়ে তৈরি পাখার চাহিদা বেড়ে যায় বহুগুণ। পাখা বানিয়ে অনেকের সংসারে ফিরেছে স্বচ্ছলতা। এই কাজে গ্রামের নারীরাই মূখ্য ভূমিকা পালন করছেন।

প্রসঙ্গত, ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) ঢাকা আহছানিয়া মিশন (ডাম)-এর একটি বিশেষ অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান। ২০১৪ সালের জুন মাসে প্রতিষ্ঠিত এই ফাউন্ডেশন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে কাজ করে যাচ্ছে।

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, দৈনিক ভোরের আকাশ পত্রিকায় প্রকাশিত

লেয়ার মুরগীতে স্বাবলম্বী মনোয়ারা

একলাছ হক

লেয়ার মুরগী পালন করে এখন স্বাবলম্বী মোছা. মনোয়ারা বেগম। এই সফলতার পেছনে সততা ও পরিশ্রমের কথাই বলেছেন। তিনি ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার সুলাখালী গ্রামের গৃহিণী। লেয়ার মুগরী পালন করে এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছেন। বর্তমানে তিনি একজন সফল উদ্যোক্তা। তার লেয়ার মুরগী পালনের সাফল্য দেখে এলাকার অনেক বেকার যুবক লেয়ার মুরগী পালন কার্যক্রম শুরু করেছেন।

তিনি লেখাপড়ায় ৮ম শেণি পাস করেছেন। এক ছেলে দুই মেয়ে ও মাসহ মোট ছয়জনের পরিবার তার। অভাব অনটনের মাঝেই সংসার পরিচালনার দায়িত্ব পড়ে তার ওপর। গত কয়েকবছর আগে নিজের সংসারে উপার্জন না থাকায় তিনি কি করবেন ভেবে পারছিলেন না।

এদিকে ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে সুলাখালী গ্রামে ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) সোনাগাজী ব্রাঞ্চের অধীনে কুসুম/২২ নামে একটি দল গঠিত হয়। দলটির সভানেত্রী মোছা. কমলা বেগম দলের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করে আসছেন। মনোয়ারা বেগম ঐ দলে ভর্তি হন এবং পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা ছক প্রণয়ন করে অফিসে জমা দেন। পরিকল্পনা ছক অনুযায়ী সোনাগাজী ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মনোয়ারা বেগমের সাথে তার বাড়িতে বসে লেয়ার মুরগী পালন করার বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনার মাধ্যমে উঠে আসে যে, তার ২০ শতাংশ জমির উপরে লেয়ার মুরগী পালন করার জন্য একটি ঘর রয়েছে। সেখানে ২ হাজার লেয়ার মুরগী পালন করা যেতে পারে। লেয়ার মুরগী পালন খুব উপযোগী হওয়ায় সকলেই একমত হয়ে ১ম ধাপে শান্তি বিনিয়োগ অগ্রসর কার্যক্রমের আওতায় এক লাখ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। উক্ত ঋণের টাকা দিয়ে ৮০০টি লেয়ার মুরগী কেনেন মনোয়ারা।

১ম ধাপে ৮০০টি মুরগীর ডিম বিক্রয় করে ব্যয় বাদে ৫০ হাজার টাকা লাভ হয়। সেই থেকে তিনি আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে যুব উন্নয়ন অফিস থেকে লেয়ার মুরগী পালনের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে ডিএফইডি'র কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ ও পরার্মশ নিয়ে তিনি নিজে আরও ১০০০ লেয়ার মুরগীর জন্য দুইটি

শেড তৈরি করেন এবং ২০০০ লেয়ার মুরগী পালন শুরু করেন। বর্তমানে তিনি উক্ত লেয়ার মুরগীর বিষ্ঠা দিয়ে বায়োগ্যাস তৈরি করে নিজের বাড়ির রান্নার জ্বালানীর কাজ করছেন, পাশাপাশি আরও ৮টি বাড়ি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করছে। এতে করে পরিবেশের কোনো ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে না।

লেয়ার মুরগীর ডিম বিক্রয় করে এ বছর দুই লাখ টাকা লাভ করেছেন। সোনাগাজী ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ও এরিয়া ম্যানেজার মো. রবিউল ইসলাম নিয়মিত লেয়ার মুরগী পালন প্রকল্প পরিদর্শন করেন। লেয়ার মুরগী পালন প্রকল্পে তার নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি আরও ২জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। পাইকারগণ সরাসরি তার প্রকল্প থেকে ডিম ক্রয় করে নেন।

মনোয়ারা বেগম বলেন, প্রথমে যখন এই মুরগীর ফার্ম শুরু করি তখন এতো সহজ ছিলো না। শুরুতে মাত্র ৭০টি লেয়ার মুরগী নিয়ে কার্যক্রম শুরু করি। পরবর্তীতে এই ৭০টি মুরগী থেকে ভালো আয় হতে থাকে। তারপর থেকে মুরগীর পরিমাণ বাড়াতে থাকি। এখন আমার মুরগীর আয় দিয়ে সুন্দরভাবে সংসার চলে।

মাসে ডিম বিক্রি করেন ৪ লাখ টাকা

বায়োগ্যাস প্লান্টের সাহায্যে উৎপাদিত গ্যাস দিয়ে তিনি ৮টি বাড়িতে বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য লাইন দিয়েছেন। এতে তার মাসিক আয় হয় ২৫ হাজার টাকা। ইতোমধ্যেই তিনি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবসা পরিচালনার জন্য ট্রেড লাইসেন্স, পরিবেশ সনদসহ অন্যান্য সব সনদ নিয়েছেন। মুরগীর দুইটি খামারে তিনি নিজে ও পরিবারের লোকজন নিয়ে কাজ করছেন। মুরগীকে খাবার ও পানি খাওয়ানোর জন্য ব্যবহার করেছেন অটোমেটিক পদ্ধতি, যাতে খাবার ও পানি অপচয় না হয়।

মাসে ডিম বিক্রি করেন ৪ লাখ ৫ হাজার টাকার। ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি এলাকার লোকজনও তার বাড়ি থেকে ডিম নিয়ে যায়। মুরগীর ফার্মের সাথে তার একটি মৎস্য প্রকল্পও আছে। এতে তিনি নানা জাতের মাছের চাষ করেছেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ফেনী এরিয়া ম্যানেজার মো. রবিউল ইসলাম বলেন, মোছা. মনোয়ারা বেগম লেয়ার মুরগীর খামার পরিচালনার মাধ্যমে নিজে স্বাবলম্বী হয়েছেন। পরিবারের আয়-রোজগার বৃদ্ধি করেছেন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন। তিনি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখছেন।

২১ জানুয়ারি ২০২৩, দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় প্রকাশিত

কর্মী থেকে সফল উদ্যোক্তা চট্টগ্রামের মজিবুর

তামজিদ হাসান তুরাগ

মজিবুর রহমান একজন তরুণ উদ্যোক্তা। তিনি তাঁর জীবনের শুরুতে কাজ করেছেন একটি গার্মেন্টস কর্মী হয়ে। পরবর্তীতে নিজেই শুরু করেছেন গার্মেন্টেসের ব্যবসা। করোনার ধাক্কা কাটিয়ে তিনি হয়েছেন চট্টগ্রামের অতি পরিচিত মুখ। কুড়িয়েছেন তরুণ উদ্যোক্তার খ্যাতি। নিজেই প্রতিষ্ঠা করেছেন মা ফ্যাশন নামের একটি গার্মেন্টস কোম্পানি। বর্তমানে তিনি মা ফ্যাশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রতিমাসে এখন তিনি রপ্তানি করছেন ৩৫ থেকে ৪০ লাখ টাকার গার্মেন্টস পণ্য। তবে তার এই সফলতার পেছনে অবদান রেখেছে আহ্ছানিয়া মিশনের ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভলপমেন্ট (ডিএফইডি)-এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম।

২০১৮ সালে মজিবুর রহমান কাজ শুরু করেন চট্টগ্রামের ফারাজানা গ্রুপে। সেখানে তিনি কাজ করতেন জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে। আবার পড়াশুনা সব চট্টগ্রামে। ২০১৮ সালে মার্চ মাসে তিনি চট্টগ্রামের পাহাড়তলি এলাকার সাগরিকা রোডে প্রতিষ্ঠা করেন মা ফ্যাশন। শুরুতে তার প্রতিষ্ঠানে সুইং মেশিন ছিলো ৬টি আর কর্মী ছিলো মাত্র ১২ জন। সে সময়েও প্রতিমাসে তিনি রপ্তানি করেছেন ৬ থেকে ৭ লাখ টাকা। ২০২০ সালে শুরুতে তিনি ব্যবসা বড় করতে শুরু করেন। ঠিক তখনই বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে হানা দেয় কোভিড। কোভিডের ধাক্কা সামলিয়ে উঠতে তিনি ঋণ নেন ডিএফইডি'র ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম থেকে। তারপর থেকে আর তাকে পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। বর্তমানে তার কারখানাতে মেশিন রয়েছে ৭৮টি। এখন প্রতিমাসে তিনি ৩৫ থেকে ৪০ লাখ টাকার পণ্য দেশের বাইরে রপ্তানি করেন।

সম্প্রতি সরেজমিনে মা ফ্যাশনের কারখানায় গিয়ে দেখা যায় কর্মব্যস্ত সময় পারছেন সেখানকার শ্রমিকেরা। বর্তমানে কারখানার দুইটি ফ্লোরে কাজ করছেন ১৪২ জন শ্রমিক। এর মধ্যে নারী শ্রমিকের সংখ্যাই বেশি। তার কারখানাতে প্যান্ট, শার্ট, টিশার্ট, নাইটি প্রভৃতি পোশাক তৈরি করা হয়। এসব পণ্য রপ্তানি করা হয় ইউরোপ, দুবাই, কানাডায়।

কথা হয় মা ফ্যাশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মজিবুর রহমানের সঙ্গে। তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, আমি প্রথমে

আমার কর্মজীবন শুরু করি একটি ফ্যাশন কারখানার জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে। সেখানেই আমার মূলত এই ব্যবসার হাতে খড়ি। সেখান থেকে ২০১৮ সালে প্রথম প্রতিষ্ঠা করি মা ফ্যাশন। তখন থেকেই চলছে ব্যবসা। এখন গড়ে প্রতিমাসে ৩৫ থেকে ৪০ লাখ টাকার পণ্য বিদেশে রপ্তানি করি। আমার সব পণ্যই রপ্তানিযোগ্য পণ্য। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, করোনার কারণে সারা বিশ্বের মতো আমার ব্যবসা কিছুটা থমকে যায় কিন্তু ডিএফইডি'র ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সে সময় আমাকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতা করে। তাদের সহজ শর্তের ঋণ আমার মতো ব্যবসায়ীদের জন্য কাজের অনুপ্রেরণা।

এখন গড়ে প্রতিমাসে ৩৫ থেকে ৪০ লাখ টাকার পণ্য বিদেশে রপ্তানি করি। আমার সব পণ্যই রপ্তানিযোগ্য পণ্য।

মজিবুর রহমান জানান, আমার কারখানায় আসা শ্রমিকদের প্রথমে কাজ শিখিয়ে নিতে হয়। তারপর তারা দক্ষ হয়ে কাজ করে। শ্রমিকদের বেতন ১০ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ৩৫ হাজার টাকা পর্যন্ত। এছাড়া তারা দুই ঈদে দুটি বোনাস পায়। এর পাশাপাশি যখন কাজের অর্ডার বেশি থাকে তখন আমাদের সাব কন্ট্রাক্টে কাজ করতে হয়। পরামর্শ হিসেবে তিনি বলেন, অনেকে ভাবে এই ব্যবসায় অনেক টাকা। কথাটা আসলে মিথ্যা নয় তবে আমার পরামর্শ হচ্ছে যারা এখানে ব্যবসা করবেন তারা যেন আগে ব্যবসা শিখে আসেন। সামনে ডিএফইডি থেকে তার আরও ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা আছে বলেও তিনি জানান।

মূলত ডিএফইডি ২০১৪ সাল থেকে সারা বাংলাদেশে ঋণ সহায়তা দিয়ে আসছে। ২০১৯ সাল থেকে তারা চট্টগ্রামে কার্যক্রম শুরু করে। কেউ চাইলে এখান থেকে সর্বোচ্চ ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারে এবং সর্বনিম্ন ২০ হাজার টাকা। চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠানটির মোট ১৮টি ব্রাঞ্চ আছে। তারা ৫ ধরণের ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ সব ঋণ পাওয়া যায় সহজ শর্তে। কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। শুধু প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে এসব ঋণ প্রদান করা হয়। বিগত ৪ বছরে প্রতিষ্ঠানটি চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রায় ৭২ হাজার সুবিধাভোগীকে ঋণ প্রদান করেছে।

২৪ জানুয়ারি ২০২৩, দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত

কোয়েল চাষে ভাগ্য বদলেছে ইলা রাণীর

শফিকুল ইসলাম

ইলা রানীর (৫২) স্বপ্ন ছিল ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত করবেন। সুখে-শান্তিতে সংসার করবেন। কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাসে তার স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে দুই মেয়ে আর এক ছেলে চার জনের সংসার নিয়ে বিপাকে পড়েন। সংসারের দায়িত্ব কে নেবে এমন দুশ্চিন্তায় কাটতে থাকে সময়। দিশেহারা ইলা রানী কোনো উপায় না পেয়ে অন্যের বাসা-বাড়িতে কাজ শুরু করেন। সাত বছরের ছোট ছেলেকে বাজারের একটি কারখানায় নামমাত্র বেতনে কাজ ঠিক করে দেন। এভাবে কিছুদিন অনাহারে অর্ধাহারে চলতে থাকে সংসার। এই ছিল- ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার মহাদেবপুর গ্রামের বাসিন্দা ইলা রানীর দুর্দিনের সংসারের চিত্র। একদিন তিনি ভাবলেন এভাবে জীবন চলতে পারেনা। সন্তানদের লেখাপড়া শিখিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সেই ব্রত নিয়ে ভিন্ন কিছু করার পরিকল্পনা করতে থাকেন। কিন্তু কারো সাহায্য এবং পরামর্শ পাচ্ছিলেন না।

এরই মধ্যে একদিন কালীগঞ্জে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভলপমেন্টের (ডিএফইডি) ফিল্ড অফিসারের সাথে পরিচয় ও বিনিয়োগ নিয়ে কথা হয়। তারপর তিনি টগর মহিলা দলে সদস্য হন এবং প্রতি সপ্তাহে ১০০ টাকা জমা করতে থাকেন। এক পর্যায়ে বাড়িতে হাঁস-মুরগির পাশাপাশি কবুতর ও কোয়েল পাখি পালন শুরু করেন। একদিন মুরগির খাঁচা খুলতেই ৫টি কোয়েল পাখির ডিম দেখতে পান। তখন থেকে ইলা রানীর মাথায় 'কোয়েল পাখি' পালনের চিন্তা আসে। ইলা রানী ডিএফইডি থেকে প্রথম দফায় ৩০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে গড়ে তোলেন খামার। সেই থেকে তিনি এখন সফল খামারি। কোয়েল পাখি চাষে ভাগ্য বদলেছে ইলা রাণীর। খামারের নাম- 'মা কোয়েল হ্যাচারিজ অ্যান্ড পোল্ট্রি ফার্ম'।

সম্প্রতি সরেজমিনে ঘুরে দেখা যায়, ইলা রাণীর খামারের দেখভাল করেন ছেলে সেকন বিশ্বাস (২৬)। তিনি জানান, প্রথমে ৫০০ বাচ্চা নিয়ে ২০১৭ সাল থেকে কোয়েল চাষ শুরু করেন। এতে তার খরচ হয় সাড়ে তিন হাজার টাকা। প্রথম দিকে ভালোই চলছিল। কিন্তু করোনার সময় কিছুটা উদ্বিগ্ন হন তিনি। তবে করোনাকালে তার ব্যবসা বন্ধ হয়নি। লকডাউনের সময় নিজেই সাইকেলে ফেরি করে কোয়েল পাখি ও ডিম বিক্রি করতেন। সেসময়

তার পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশের এলাকায়। বিভিন্ন এলাকা থেকে তার কাছে কোয়েল পাখি ও ডিম বিক্রির অর্ডার আসে। তাদের খামারে এখন ৬টি হ্যাচারি মেশিনে প্রায় ৫০ হাজার বাচ্চা উৎপাদনের ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু গড়ে প্রতিমাসে প্রায় ৩০ হাজার কোয়েল এবং ৫/৬ হাজার ফাউমি জাতের মুরগির ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদন হচ্ছে। তার খামারে রয়েছে সাড়ে ৩ হাজার কোয়েল পাখি এবং ১৫০টি ফাউমি জাতের মুরগি। দোতলা ঘরের ছাদে কোয়েল পাখির খামার। এখন প্রায় আড়াই হাজার কোয়েলের ডিম মিলছে।

সেকন বিশ্বাস বলেন, তিনি একসময় স্থানীয় গ্যাসের দোকানে কাজ করতেন। সেসময় প্রতিবেশির কোয়েল পাখির খামার দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেও উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে প্রশিক্ষণ নিয়ে হ্যাচারি সম্পর্কে বিশদ জানেন। করোনার আগে ২০১৮ সালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ডিএফইডি থেকে ৩০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে উপকৃত হন। এরপর কিস্তি পরিশোধ করে ঋণ নবায়ন করতে থাকেন। বর্তমানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন থেকে ২ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসায় উপকৃত হচ্ছেন। ১২ মাসের কিস্তি হলেও আগেই ঋণের টাকা পরিশোধ করেন। তিনি জানান, এখন তার পুঁজি প্রায় ৬ লাখ টাকা। সবকিছু বাদ দিয়েও গড়ে প্রতিমাসে তার আয় হয় ৪৫-৫০ হাজার টাকা। এরমধ্যে তিনি পাকা ঘর করেছেন, মোটরসাইকেল কিনেছেন এবং বোনের বিয়েতে সহযোগিতা করেছেন। নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য তিনি বলেন, যারা অযথা ঘুরে ফিরে সময় নষ্ট করে তারাও কিন্তু এভাবে প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বল্প পুঁজি দিয়ে উদ্যোক্তা হতে পারেন। এতে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারবে।

ইলা রাণী বলেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ঋণ দিয়ে যে উপকার করেছে আমি তাতে কৃতজ্ঞ। আমি এই হ্যাচারিকে আরও বড় করতে চাই, সেজন্য অর্থের প্রয়োজন। এজন্য সরকারি বেসরকারি সহায়তাকারী সংস্থা সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসলে উপকৃত হবো। ১০ হাজার কোয়েল পাখি পালনের জন্য অবকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা আছে তার।

স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক রিপন মণ্ডল জানান, সেকনের কর্মস্পৃহা প্রশসংনীয়। আর্থিক সমস্যার কারণে পড়াশোনা করতে কষ্ট হলেও মাস্টার্স পড়ছেন যশোর এমএম কলেজে। আসলে তার নিজে থেকে কিছু করার ইচ্ছা বেশি। সেই জায়গা থেকেই আজকে মাকে নিয়ে কোয়েল পাখির খামার দিয়ে সে সফল। তাকে দেখে অনেকেই অনুপ্রাণিত হচ্ছেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ শাখার ম্যানেজার মো. মোহসীন কালবেলাকে বলেন, ইলা রাণীর পারফরমেন্স ভালো। এক সময় অন্য এনজিওতে যখন ঋণের জন্য ঘুরে ঘুরে ব্যর্থ হয়েছেন তখন ডিএফইডি প্রথমে তাকে ৩০ হাজার টাকা ঋণ দিয়েছে। তাকে আমরা একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছি। ডিএফইডি তাকে আরও সহযোগিতা করতে আগ্রহী। অনেকেই তাকে দেখে উদ্যোক্তা হয়েছেন। আরও উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে। যারা সেবা নিতে চায় তাদেরকে সহযোগিতা দেওয়া হবে।

২১ জানুয়ারি ২০২৩, দৈনিক কালবেলা পত্রিকায় প্রকাশিত

মাল্টা চাষে সুদিন ফিরেছে নাসরিন খাতুনের

হাসান আলী

স্বামী ও দুই সন্তান নিয়ে ভালোই চলছিল রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলার শিমুলিয়া গ্রামের মোছা. নাসরিন খাতুনের (২৮) সংসার। স্বামী মো. আশফাকুল ইসলামের (৩৭) একটি কোম্পানিতে চাকরি থেকে প্রাপ্ত আয়ে ভালোই চলছিল তাদের সংসার; কিন্তু হঠাৎ করে আশফাকুলের চাকরি চলে যাওয়ায় বিপত্তিতে পরে এই দম্পতি। এ সময় তারা সংসার চালাতে কাজ খুঁজতে থাকেন চার দিকে। দিনমজুরি ও ধারদেনা করে চলতে থাকে সংসার। বিভিন্ন ব্যবসার চিন্তা মাথায় এলেও মূলধনের অভাবে এগোতে পারেননি।

এমনই সময়ে টিভিতে মাল্টা চাষের একটি প্রতিবেদন দেখে আগ্রহ জন্মায় তার; কিন্তু বিপত্তি বাধে মূলধনে। নাসরিন-আশফাকুল দম্পতি যখন সংসার ও স্বাবলম্বিতার স্বপ্ন নিয়ে চরম বিপাকে ঠিক তখনি তাদের আশার আলো হয়ে হাজির হয় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের 'ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট' (ডিএফইডি)। লোকমুখে শুনে পরিচিত হন ডিএফইডি'র ফিল্ড অফিসারের সাথে। এরপর সদস্য হন সংস্থাটির চারঘাট ব্রাঞ্চের জুঁই দলের। সেখান থেকে বাই মোয়াজ্জেল পদ্ধতিতে এক লাখ টাকা ঋণ নিয়ে উপজেলা সদর থেকে আট কিলোমিটার দূরে শিমুলিয়া গ্রামে ২০১৮ সালের মার্চ মাসে চারজন মিলে যৌথভাবে শুরু করেন মাল্টা চাষ।

শুরুতে দুই বিঘা জমিতে ২৩০টি (বারি-১) জাতের মাল্টাগাছের চারা লাগান। নাসরিন খাতুন সদস্য হিসেবে ঋণ নিলেও সবকিছু তার স্বামীই দেখাশোনা করেন। বাগানে প্রথম ধাপে তেমন ফলন না হলেও খরচের টাকা উঠে আসে। পরবর্তী চারটি মৌসুমে তিন লক্ষাধিক টাকা আয় করেন তিনি। তৃতীয় ধাপের মাথায় মাল্টা চাষের আয় থেকে ঋণ পরিশোধ করেন এবং লাভের টাকা দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আরও তিনটি মাল্টার বাগান এবং আম ও পেয়ারার ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন। মাল্টা ও ব্যবসার আয় দিয়ে ইতোমধ্যে তিনি পাকা বাড়ি ও একটি মোটরসাইকেল কিনেছেন। ব্যবসার পরিধি বাড়ানোর পাশাপাশি মাল্টা বাগানে পাঁচজনের অস্থায়ী কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি করেছেন, যারা দৈনিক ৫০০ টাকার বিনিময়ে এখানে কাজ করে থাকেন।

এ ছাড়াও আশফাকুল বাগানে আম, পেঁপে, লেবু ও অন্যান্য ফসলও লাগিয়েছেন। ফলে মাল্টার মৌসুম না হলেও

একই ক্ষেত থেকে আরও অনেক টাকা আয় করছেন। তুলনামূলক কম খরচ এবং লাভজনক হওয়ায় গ্রামে আরও বেশ কয়েকজন কৃষক চাষ শুরু করেছেন।

নাসরিন খাতুন বলেন, সংসারে যখন অভাব চলছিল তখন কী করা যায় এটা নিয়ে চিন্তায় ছিলাম। একদিন টিভিতে মাল্টা চাষের প্রতিবেদন দেখে আমার স্বামীকে বলি। তিনিই সবার পরামর্শ নিয়ে ডিএফইডি থেকে ঋণ নেন। সেই সময়ের ঋণের এক লাখ টাকা আমাদের অনেক বড় উপকার করেছিল।

আশফাকুল বলেন, আমাদের এলাকায় কোনো বাগান ছিল না। আমি অংশীদারদের সাথে নাটোরে গিয়ে একটি বাগান ঘুরে দেখি। এরপর কোহিনুর নার্সারি থেকে চারা কিনি। কিন্তু খরচ নিয়ে ঝামেলায় পড়লাম। এরপর 'ডিএফইডি' থেকে ঋণ নিয়ে সাহস করে শুরু করলাম। এখন আল্লাহর রহমতে আমিই তিনটি বাগানের মালিক। পাশাপাশি আমি আম ও পেয়ারার ব্যবসা করছি। তিনি বলেন, আগের কয়েকটি ধাপের সঠিক হিসাব না থাকলেও সর্বশেষ মৌসুমে আমার বাগানে সর্বমোট ৬২ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। আর সেখান থেকে প্রায় আড়াই লাখ টাকার মাল্টা বিক্রি করেছি। আরও কেউ যদি এটি করতে চায় তাদের বলব, এটা অত্যন্ত লাভজনক এবং অন্য ফসলের তুলনায় খরচ খুবই কম। একই সাথে প্রচুর ফলনও হয়। তাই অন্য দিকে না গিয়ে সবাইকে মাল্টা চাষের দিকে ঝুঁকতে অনুরোধ করব।

ডিএফইডি'র চারঘাট ব্রাঞ্চের ম্যানেজার মিজানুর রহমান বলেন, আমাদের চারঘাট ব্রাঞ্চে এখন ৯ শতাধিক সদস্য আছে। যাদের মধ্যে সাত শতাধিক ক্ষুদ্রঋণ বিনিয়োগের আওতাধীন। আমাদের বর্তমানের অনেক সফল প্রজেক্টের মধ্যে অন্যতম একটি হলো নাসরিন খাতুনের মাল্টার বাগান। আমাদের বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়। মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরে আমরা গর্ববোধ করি। ফাউন্ডেশনের এরিয়া ম্যানেজার (রাজশাহী-২) আমিরুল ইসলাম বলেন, আমরা মূলত এটাকে শান্তি বিনিয়োগ বলে থাকি। যেটা একটি ইসলামী শরিয়াহভিত্তিক লেনদেন। আমরা এটি 'বাই মোয়াজ্জেল' (বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়) পদ্ধতিতে করে থাকি। আমরা মূলত টাকা দিই না, গ্রহীতার নিকটাত্মীয় কাউকে এজেন্ট হিসেবে রেখে আমরা তাকে পণ্য দিই, যেখান থেকে ইনকাম জেনারেট হয় বা সম্পদ তৈরি হয়। এভাবেই নাসরিন খাতুন ঋণ নিয়েছিলেন এবং তার পরিবার স্বাবলম্বী হয়েছে।

৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, দৈনিক নয়াদিগন্ত পত্রিকায় প্রকাশিত

নাহিদার খামারে এখন ৪০টি ছাগল ও ১৪টি গরু

সমকাল প্রতিবেদক

নাহিদা সুলতানা চট্টগ্রাম জেলার বন্দর থানার আনন্দবাজার এলাকা বাসিন্দা। স্বামীর সংসারে অভাব ছিল। সেই অভাব ঘোচাতে নেমে পড়েন জীবনযুদ্ধে, পথ খুঁজতে থাকেন কীভাবে সংসারের অভাব দূর করার পাশাপাশি স্বাবলম্বী হওয়া যায়। সেই লক্ষ্যে ২০১৭ সালে মাত্র একটি ছাগল দিয়ে শুরু করেন তার খামার। কঠোর পরিশ্রম, মেধা ও পশুপ্রেম তাকে ধীরে ধীরে সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়।

নাহিদার এই সফলতার গল্পটি একদিনের নয়। নাহিদার স্বামী আলমগীর হোসেন একজন পিকাপ ড্রাইভার। তিনি গার্মেন্টসের মালামাল এক ফ্যাক্টরি থেকে অন্য ফ্যাক্টরিতে পরিবহণ করেন। সাগর পাড়ের নাহিদা ও তার স্বামী আলমগীরের রয়েছে আরও চারটি সন্তান। তিন ছেলে এক মেয়ে অর্থাৎ সংসারের সদস্য সংখ্যা ৬। যেখানে উপার্জনকারী মাত্র একজন। তাও আবার অত্যন্ত নগন্য আয়।

স্বামী অর্থ উপার্জন করলেও সেই অর্থ দিয়ে পুরো ৬ জনের সংসার চালাতে হয় নাহিদার। তাই নাহিদাই বুঝে এই স্বল্প আয় দিয়ে কতোটা কষ্ট করে সংসার পরিচালনা করতে হয়। অভাব-অনটন নিত্যদিনের সঙ্গী। নাহিদার মাথায় স্বামীর পাশাপাশি নিজেরও কিছু উপার্জনের কথা মাথায় আসে। যা দিয়ে সংসারের স্বচ্ছলতা আসবে এবং একটু ভালোভাবে জীবনযাপন করবে। এই লক্ষ্যেই ২০১৭ সালে মাত্র একটি ছাগল দিয়ে শুরু করেন তার খামার। ধীরে ধীরে এগুলোও ২০২০ সালের করোনা এই আয়ের বাধা ফেলে দেয়।

নাহিদা বলেন, 'স্বামী সন্তানের আয়ের পাশাপাশি আমার ছাগলের খামার থেকে যা আয় আসে তা দিয়ে সুন্দরভাবে চলছে আমার সংসার।' তিনি আরও জানান, ২০২০ সালে করোনা মহামারির সময় হঠাৎ তার স্বামী-সন্তানের চাকরি চলে যায়। স্বামী-সন্তানের চার মাসের বেকারত্বে আবারও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন তিনি।

করোনাকালীন দুঃসময়ে বসে না থেকে বেকার স্বামী-সন্তানকে নিয়ে খামারের পরিধি বাড়ানোর চেষ্টা করেন নাহিদা। আর তখনই সহায়তার হাত প্রসারিত করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক

ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)। তাকে অর্থসহায়তা করে চট্টগ্রাম-১ এরিয়া হালিশহর সিটি-১ শাখা।

নাহিদা প্রথমে ডিএফইডি'র কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকার ঋণ পায়। এই টাকা দিয়ে নাহিদা তার খামার প্রসার করার চেষ্টা করেন এবং তাতে সফলও হন। স্বামীর সাথে পরামর্শ করে ধীরে ধীরে ঋণের কিস্তি শোধ করেন এবং খামারকে আরও প্রসারিত করার পরিকল্পনা করেন। পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় ধাপে নেন ১ লাখ টাকা। এরপর তৃতীয় ধাপে নেন ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং সর্বশেষ চতুর্থ ধাপে নাহিদা ডিএফইডি থেকে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা। প্রতি ধাপে টাকা নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে কিস্তি পরিশোধ করেন তিনি। সাথে সাথে বড় হতে থাকে তার খামার।

নাহিদা তার জীবনযুদ্ধে সাফল্যের ছোঁয়া পেয়েছেন। নাহিদার পশুপ্রেম ও খামারকে আরও বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

বর্তমানে নাহিদার খামারে ৪০টি ছাগল এবং ৮টি বিদেশি গাভীসহ মোট ১৪টি গরু রয়েছে। ভবিষ্যতে তিনি তার খামারকে আরও প্রসারিত করতে চান।

নাহিদা বলেন, করোনার কারণে স্বামীর আয় বন্ধ হয়ে গেছিল। আমারও কোন আয় ছিল না। সেই দুর্দিন থেকে আমরা এখন উঠে এসেছি। এ জন্য আমি ডিএফইডিকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

হালিশহর শাখার ব্যবস্থাপক মো. সাদ্দাম হোসাইন বলেন, 'নাহিদা তার জীবনযুদ্ধে সাফল্যের ছোঁয়া পেয়েছেন। তার স্বামী-সন্তানও এখন চাকরির পাশাপাশি খামারের দেখাশোনা করেন। নাহিদার পশুপ্রেম ও খামারকে আরও বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।'

তিনি আরও বলেন, ডিএফইডি এই এলাকায় ২০১৯ সাল থেকে কার্যক্রম শুরু করেছে। তুলনামূলকভাবে সহজশর্তে ঋণ হওয়ায় নিম্ন আয়ের মানুষেরা উদ্যোক্তা হতে আমাদের সহযোগিতা গ্রহণ করে, আমরাও তাদের সহযোগিতার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকি।

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, দৈনিক সমকাল পত্রিকায় প্রকাশিত

ট্রাউজারে ব্যবসায় ভাগ্য বদল খুসু বেগমের পরিবারের

জেডএএম খায়রুজ্জামান

শিল্প বাণিজ্যিক নগরী হিসেবে পরিচিত নারায়ণগঞ্জ। সেই শিল্প নগরীর শিল্প এখন ছড়িয়ে পড়েছে নগরীর বাইরে জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে। অর্থাৎ ক্ষুদ্র, মাঝারি ও ভারী শিল্পের ভার এখন জেলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে। সেখানকার প্রান্তিক মানুষগুলো হয়ে উঠছে কর্মী থেকে উদ্যোক্তা। কেউ কেউ ক্ষুদ্র পর্যায় থেকে শুরু করে আজ বৃহৎ শিল্পের মালিক। আবার প্রান্তিকতা ছেড়ে কেউ কেউ মাঝারিমানের ব্যবসায়ী হয়ে উঠছে। তেমনই একজন উদ্যোক্তা রূপগঞ্জ উপজেলার ভূলতা ইউনিয়নের টেকপাড়া গ্রামের খুসু বেগম।

খুসু বেগমের স্বামীর নাম মোহাম্মদ আলী। ২ ছেলে ও ১ মেয়ে নিয়ে তাদের সংসার। আর এই সংসারের একমাত্র উপার্জনকারী স্বামী মোহাম্মদ আলী। এলাকার অনেকের দেখাদেখি তিনি ছোট্ট পরিসরে শুরু করেছিলেন ট্রাউজার তৈরির কাজ। নিজ পরিবারের সদস্যদের কাজে লাগিয়ে ব্যবসা শুরু করে ভালোই দিন যাচ্ছিল। যা উপার্জন হতো তা দিয়ে সংসারের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটিয়েও কিছু বাড়তি জমা থাকতো। কিন্তু ধীরে ধীরে বিক্রি কমে যাওয়ার পাশাপাশি কাঁচামালের দাম বৃদ্ধির কারণে ব্যবসা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। সাথে নতুন করে শুরু করবে সে মূলধনও নেই। এমতাবস্থায় পরিবারে আয়ের বিকল্প উপায় না থাকায়, খুসু বেগম ও তার স্বামী মোহাম্মদ আলীর পক্ষে সংসার পরিচালনা দুর্বিষহ হয়ে পড়ে।

এদিকে ২০১৭ সালের ২১ অক্টোবর থেকে ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) রূপগঞ্জ ব্রাঞ্চের অধীনে টেক পাড়া গ্রামে কামেনী-০৮ নামক একটি দল পরিচালনা করে আসছে। এই দলের সভানেত্রী জরিনা বেগম যার সাথে কথা হয় খুসু বেগমের। জরিনা বেগম তার দলে খুসু বেগমকে ভর্তি হয়ে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে নিজে কিছু করার এবং তার স্বামীর ব্যবসায় মূলধন বৃদ্ধির পরামর্শ দেন। খুসু বেগম তার স্বামী মোহাম্মদ আলীর সাথে পরামর্শ করে উক্ত দলে ভর্তি হন। যার সদস্য নং ০৫৬-০০৮-০২১। ডিএফইডি রূপগঞ্জ ব্রাঞ্চ হতে শান্তি বিনিয়োগ কমসূচির আওতায় ১ম ধাপে ১ লাখ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। গৃহীত ১ লাখ টাকা দিয়ে ট্রাউজার সেলাই করার জন্য ৩টি মেশিন ক্রয় করেন তিনি। তারপর স্বামী স্ত্রী মিলে ট্রাউজার তৈরির কাজ আবারও শুরু করেন। তার স্বামী

মোহাম্মদ আলীর তৈরিকৃত ট্রাউজার গাউছিয়া, ভৈরব, টঙ্গীসহ এলাকার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নিজে পাইকারী হিসেবে বিক্রয় করেন। এতে তার প্রায় সপ্তাহে ৮-১০ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় হতো। তা থেকে সাপ্তাহিক কিস্তি ২ হাজার ৫ শত টাকা এবং ভবিষ্যৎ সঞ্চয় বাবদ ২ শত ৫০ টাকা করে জমা করেন। দিন দিন তাদের ব্যবসা চাঙ্গা হয়ে উঠে। খুসু বেগম তার প্রথম ধাপের ঋণের টাকা পরিশোধ করেন। তিনি ৬ মে ২০১৮ পুনরায় ২ লাখ- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এদিয়ে তিনি আরও ৫টি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। এবং মাসিক বেতনে তার প্রতিষ্ঠানে আরও ৫ জন শ্রমিক নিয়োগ করেন। এতে তার মাসিক আয় প্রায় ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকায় বৃদ্ধি পায় এবং তার ছেলেমেয়েকে ভালো ঘরে বিয়ে দেন। সে ২য় ধাপের টাকা পরিশোধ করে। সে তৃতীয় ধাপে ২ লাখ ৫০ হাজার এবং তৃতীয় ধাপ পরিশোধ হওয়ার পর ৪র্থ ধাপে ৩ লাখ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১৫টি সেলাই মেশিন রয়েছে। এতে ১৮ জন শ্রমিক কাজ করে। তার বার্ষিক আয় প্রায় ১৫-১৮ লক্ষ টাকা।

খুসু বেগমের স্বামী মোহাম্মদ আলী জানান, শনিবার মালামাল নিয়ে রওনা দিয়ে টঙ্গী পৌঁছাই, পরদিন রোববার টঙ্গী বাজারে বিক্রি করি। মঙ্গলবার মালামাল নিয়ে রওনা দিয়ে ভৈরব পৌঁছাই, পরদিন বুধবার ভৈরব বাজারে বিক্রি করি।

তিনি আরও জানান, শীতকালে ট্রাউজার বেশি চলে। সেকারণে গরমের সময় পাতলা কাপড় জার্সি ও থ্রি কোয়ার্টার প্যান্টও তৈরি করেন তারা।

তার কারখানায় কর্মরত মো. সোহেল জানান, তার বয়স-১৯ বছর ও বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে। কারখানাতেই রাতে থাকা হয়। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে কাজ শুরু করে রাত ১২টা পর্যন্ত কাজ করে। সাপ্তাহিকভিত্তিতে পারিশ্রমিক নিয়ে থাকেন। এতে তার মাসে প্রায় ১৮-২০ হাজার টাকা আয় হয়। মাসে প্রায় ৬ হাজার টাকা খাওয়া ও আনুষঙ্গিক খাতে খরচ হয়। বাকি টাকা গ্রামের বাড়িতে মায়ের হাতে পৌঁছে দেয়।

আরেক কর্মী রাণী আক্তার টেক পাড়ার স্থায়ী বাসিন্দা। স্বামী গার্মেন্টস-এ চাকরি করেন। ৩ মেয়ে ও ১ ছেলে নিয়ে তাদের সংসার। মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন। তিনি তার বাসার যাবতীয় কাজ-কর্ম করে যখন সুযোগ পান তখন এসে প্রোডাকশনের ভিত্তিতে কাজ করেন। এতে সপ্তাহে প্রায় ৩ হাজার থেকে ৩ হাজার ৫ শত টাকা পান। সে হিসেবে মাসে ১২ থেকে ১৪ হাজার টাকা আয় করেন। স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখেই আছেন। তিনি একজন সুখী মানুষ।

ডিএফইডি'র রূপগঞ্জের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার নাসির উদ্দিন জানান, খুসু বেগমের মতো অনেকেই আজ তাদের সহযোগিতায় উদ্যোক্তা হয়ে উঠতে পেরেছে। এ সহযোগিতা ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে।

তিনি জানান, বর্তমানে খুসু বেগম ও তার স্বামী সফল উদ্যোক্তা। আগামীতে ব্যবসা আরও সম্প্রসারণের কথা চিন্তা করছেন তিনি। তার ব্যবসায় উৎসাহিত হয়ে এলাকার অনেকেই উক্ত ব্যবসায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করে স্বাবলম্বী হয়েছে।

২৯ মার্চ ২০২৩, দি ডেইলি সান পত্রিকায় প্রকাশিত

ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে উদ্যোক্তা হলেন খালেদা

মো. সাইফুল ইসলাম

আজ থেকে এক যুগ আগের কথা। যাত্রীবাহী বাসে করে ঢাকা থেকে নরসিংদী ফিরছিলেন খালেদা বেগম। পথে হঠাৎই বিপরীত দিক থেকে আসা আরেকটি বাস পাশ থেকে ধাক্কা দেয়। ধাক্কায় বাসটি উল্টে যায় এবং জানালার পাশে বসা খালেদা বেগমের হাতে ও শরীরে প্রচন্ডভাবে বিঁধে যায় জানালার ভাঙা কাঁচ। মারাত্মকভাবে আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। শরীরের অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে সেখানে কেটে যায় বেশ কিছুদিন। কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে হাসপাতাল থেকে মুক্তি পেলেও চিরতরে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় তার ডান হাত।

জীবনে বাঁক নেয়ার একটি ছোট্ট ঘটনা। কিন্তু রেশটা অনেক গভীর। কারণ খালেদা বেগম যে শুধুই খালেদা বেগম তাই নয়, বরং সংসারের উপার্জনের একজন শক্ত হাতিয়ার। কিন্তু ঘটনা এখানে থেমে থাকেনা। অন্যের বাড়িতে কাজ করে উপার্জনকারী খালেদা বেগমের অক্ষম হওয়ার পর তার দিনমজুর স্বামী মফিজউদ্দিনও তাকে রেখে অন্যত্র চলে যায়। ছোটো ছোটো ২ ছেলে ও ১ মেয়ে নিয়ে অভাব আরও ঘনীভূত হয়। কিন্তু আহারতো জোগাতেই হবে। নিরন্নতা থেকে সন্তানদের একটুখানি হলেও মুক্তি দিতে ভিক্ষাবৃত্তিকে বেছে নেয় খালেদা। এভাবেই চলতে থাকে দিনগুলো। সন্তানেরা ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। অবশ্য পাশেই বাস করা নিজের ভাইয়ের কিছু সহযোগিতাও ছিল খালেদার পরিবারের প্রতি।

বলছিলাম নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার শুকুন্দী ইউনিয়নের উত্তর নারান্দি গ্রামের এক অসহায় নারীর কথা, যার জীবন-যুদ্ধে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে একের পর এক পরাজয় নেমে আসে। শারীরিক ও মানসিকভাবে হেরে যেতে থাকে। কিন্তু হার শেষ পর্যন্ত মানেননি। স্বামী খোঁজ-খবর না রাখলেও নিজের উদ্যমতা একেবারে মন থেকে যায়নি। ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছে বার বার খালেদা। এক পর্যায়ে এসে সফলও হন সে।

এদিকে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহায়তায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) ২০১৪ সালে নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার শুকুন্দি ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি শুরু করে। একই বছর খালেদা বেগম সমৃদ্ধি কর্মসূচির সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে

২০১৬ সালে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও শুকুন্দি ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য খালেদা বেগমকে উদ্যমী সদস্য হিসেবে নির্বাচন করার জন্য সংস্থার কাছে সুপারিশ করেন। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে খালেদা বেগমকে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য ১ লক্ষ টাকা অনুদান দেয়া হয়। তার মধ্যে ৮০ হাজার টাকা দিয়ে ১টি ইজিবাইক কিনেন ও ২০ হাজার টাকা দিয়ে বাড়ির সামনে মুদির দোকান শুরু করে। খালেদার বড় ছেলে ইজিবাইক চালানো শুরু করে আর খালেদা ও তার বৃদ্ধ মা দোকান পরিচালনা শুরু করেন।

জীবনে মোড় ঘুরতে শুরু করে। অনুদান পাওয়ার পর থেকেই সে ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে দোকান পরিচালনায় মনোযোগী হন। দোকান ও ইজিবাইক থেকে তার মাসিক আয় প্রায় ১৫ থেকে ১৮ হাজার টাকা। ছোটো ছেলে ও মেয়ের লেখাপড়া খরচ যুগিয়েও সংসার চলছে। স্বচ্ছলতার হাসি ফুটে উঠেছে। ডিএফইডি'র মনোহরদী শাখা ব্যবস্থাপক মো. শরিফুল ইসলাম জানান, ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে কর্মসংস্থানের পথ হওয়ায় এলাকায় তার সম্মান ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

অনুদান পাওয়ার পর থেকেই সে ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে দোকান পরিচালনায় মনোযোগী হন। দোকান ও ইজিবাইক থেকে তার মাসিক আয় প্রায় ১৫-১৮ হাজার টাকা।

তিনি আরও জানান, খালেদা বেগমের বর্তমানে সম্পদের পরিমান প্রায় ৩ লাখ টাকা। তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ব্যবসা আরও বড় করা। আর ছোটো ছেলে ও মেয়েকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করা।

৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ পত্রিকায় প্রকাশিত

মাছ চাষ করে স্বাবলম্বী মো. সাদেকুর রহমান

খন্দকার জান্নাতুন নাহার জেরি

নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার গন্ডারদিয়া গ্রামের মো. হাফিজ উদ্দিনের পুত্র মো. সাদেকুর রহমান। তিনি পরিবারের বড় সন্তান। আলিম পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। বৃদ্ধ বাবা ও তার ৩ ভাইসহ মোট পরিবারে সদস্য সংখ্যা-৭। ভাইদের মধ্যে তিনি বিবাহিত। সংসার পরিচালনার দায়িত্ব তার ওপর। নিজের কর্ম ও সংসারে উপার্জন না থাকায় তিনি কি করবেন ভেবে উঠে পারছিলেন না। ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে গন্ডারদিয়া গ্রামে ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) মনোহরদী ব্রাঞ্চের অধীনে একতা নামে একটি দল গঠিত হয়। দলটির সভানেত্রী মোছা. তাসলিমা বেগম। এ অবস্থায় ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মো. সাদেকুর রহমানের সাথে সভানেত্রীর কথা হয় এবং সভানেত্রী তাকে একতা দলে স্ত্রী রহিমা বেগমকে ভর্তি করার মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করতে বলেন এবং নতুন করে মাছ চাষ শুরু করতে উৎসাহ প্রদান করেন।

ডিএফইডি পরিচালিত সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়ন হওয়ায় উদ্যোগ উন্নযন কর্মকর্তা মো. সাদেকুর রহমানের পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা ছক প্রণয়ন করে অফিসে জমা দেন। পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা ছক অনুযায়ী মনোহরদী ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ও সমৃদ্ধি প্রোগ্রাম কো-অডিনেটরের সাথে সাদেকুর রহমানের মাছ চাষ করার বিষয়াদি আলোচনা হয়। আলোচনায় উঠে আসে যে, সাদেকুরের ২০ শতাংশের একটি পুকুর আছে এবং পরিকল্পনা করে মাছ চাষ করেন না। তবে পুকুরটি মাছ চাষের খুব উপযোগী হওয়ায় ১ম ধাপে আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ৫০ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করা হয় সাদেকুরকে। সমৃদ্ধি উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মকর্তার পরামর্শে মো. সাদেকুর রহমান প্রথমে মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ শুরু করেন। প্রথম ১ বছরে মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছ করে ব্যয় বাদে ১ লাখ ১০ হাজার টাকা লাভ করেন।

তাতে ডিএফইডি ঋণের কিস্তি পরিশোধ করে সংসার চলাতে সমস্যা হয়নি। ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে একতা দলের মাধ্যমে ডিএফইডি মনোহরদী ব্রাঞ্চ থেকে আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের ২য় ধাপে ৮০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে আরও ৭৫ শতাংশের ২টি পুকুর লিজ নিয়ে মোট ৩টি পুকুরে শিং, কই ও মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ করেন।

দ্বিতীয় বছর মো. সাদেকুর রহমান শিং, কই ও মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছ চাষ করে ব্যয় বাদে মোট ৩ লাখ টাকা লাভ করেন। সেই থেকে আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে যুব উন্নয়ন অফিস থেকে মাছ চাষের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এরপর একতা দলের মাধ্যমে ডিএফইডি মনোহরদী ব্রাঞ্চ থেকে আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের ৩য় ধাপে ১ লাখ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন।

উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ ও পরামর্শ নিয়ে তিনি নিজে ২টি পুকুর খনন করেন এবং আরও ২টি পুকুর লিজ নিয়ে মোট ৭টি পুকুরে মাছ চাষ করছেন। তিনটি পুকুরে শিং, কই ও মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছের রেনু চাষ করেন। এই রেনু ময়মনসিংহ কৃষি ইনির্ভাসিটি থেকে সংগ্রহ করেন। নিজের পুকুরের পোনা সংগ্রহ চাহিদা পূরণ করে বাহিরে অন্যদের মধ্যে পোনা বিক্রয় করে এ বছর ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা লাভ করেছেন। মনোহরদী ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ও সমৃদ্ধি প্রোগ্রাম কো-অডিনেটর নিয়মিত মৎস্য প্রকল্প পরিদর্শন করেন।

বর্তমানে তিনি ৭টি পুকুরে শিং, কই ও মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছ চাষ করেন। তার মাছ চাষ প্রকল্পে ৫জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। তার পুকুরের মাছ নেয়ার জন্য ঢাকার পাইকারগণ সরাসরি পুকুর পাড় থেকে ক্রয় করে নেন। এই বছর তার ব্যয় বাদে ৭ লাখ টাকা লাভ হবে আশা করেন। মো. সাদেকুর রহমান মাছ চাষে এলাকায় সফল একজন উদ্যোক্তা। তার মাছ চাষে সাফল্য দেখে এলাকার অনেক বেকার যুবক মাছ চাষ শুরু করেছেন।

২৫ মার্চ ২০২৩, দি ডেইলি বাংলাদেশ টুডে পত্রিকায় প্রকাশিত

ছোনিয়া আক্তারের কাঁকড়া চাষের সফল কাহিনী

নিউ নেশন প্রতিনিধি

ছোনিয়া আক্তার সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার প্রত্যন্ত গুমন্তলী গ্রামের এক দরিদ্র, সাক্ষরজ্ঞানহীন মো. আমিনুর রহমানের স্ত্রী। সংসারে এক মেয়ে ও এক ছেলে সন্তান। সংসার জীবন শুরু করার পর থেকেই অভাব অনটন যেন নিত্যদিনের সঙ্গী। খাওয়া-পরা, চিকিৎসা-কোনোকিছুই ঠিকমতো জোটে না, থাকার মতো যে ঘরটুকু রয়েছে সেটাও বেড়ার তৈরি। ভিটা ছাড়া আর কোনো আবাদি জমি নেই তার স্বামীর।

প্রতিদিন তার স্বামীর দিনমজুরের ওপর নির্ভর করে সংসারের সকল খরচ। ছোনিয়া আক্তার হতাশ হয়ে যায় কী করবে, কীভাবে সংসার চলবে এই চিন্তা। ছেলেমেয়ের লেখাপড়া ও অন্যান্য খরচ দিন দিন বাড়তে থাকে। ছোনিয়া ভাবে তার স্বামীর দিনমজুরের ওপর সংসার চালানো অনেক কষ্টের তাই নিজে কিছু একটা করার চিন্তা করেন। তিনি বাড়ির পাশের এক ভাবির কাছে জানতে পারেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ক্ষুদ্রঋণ (ডিএফইডি)-এর আওতায় দল গঠনের মাধ্যমে আগ্রহী ও কর্মঠ দরিদ্র মহিলাদের সদস্য করে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করে আসছে। ছোনিয়া সেই ভাবির সাথে গিয়ে ডিএফইডি'র মাঠ কর্মীর সাথে কথা বলে দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি ১১ মার্চ ২০১৮ সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার গুমন্তলী গ্রামে ডিএফইডি'র গঠিত গুমন্তলী-১১৬ দলের সদস্য হয়ে সাপ্তাহিক ১০০ টাকা করে সঞ্চয় জমা করতে থাকেন।

পরবর্তীতে একমাস পর তিনি পার্শ্ববর্তী এক ব্যক্তির কাঁকড়ার খামারে কাজ শুরু করেন এবং কীভাবে কাঁকড়া চাষ করতে হয় তা শিখে নেন। এভাবে দুই মাস কাজের পাশাপাশি লোকাল প্রশিক্ষণ নিতে থাকেন।

প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর তার নিজের একটি কাঁকড়ার খামার করতে আগ্রহ জাগে। তাই ২ বিঘা জমির একটি ঘের লিজ নিয়ে কাঁকড়ার খামার শুরু করেন। ছোনিয়া আক্তার প্রথম দফায় ৩০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে, অল্প সংখ্যক কাঁকড়া ক্রয় করে চাষ করতে থাকেন। প্রথম দফায় সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে ৫ হাজার ৫ শত লাভ হয়। এই পরিমাণ লাভের পর তার ও তার স্বামীর আগ্রহ বেড়ে যায়। এরপর লাভের টাকা ও আসল টাকা মিলিয়ে পর্যায়ক্রমে কাঁকড়ার চাষ বাড়াতে থাকে, এভাবে ছোনিয়ার কাঁকড়ার পয়েন্টের উৎপাদন ও বিক্রি চলতে থাকে।

ছোনিয়ার এভাবে তিনবার ঋণ পরিশোধ করে বর্তমান ৪ দফায় ৫০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং তার নামে সঞ্চয় জমা আছে ১০,৫০০ টাকা। ঠিকমতো ঋণের কিস্তি পরিশোধ করছে, ঋণের কিস্তি পরিশোধে তার কোনো সমস্যা হচ্ছে না। ছোনিয়া বেগম এখন অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল। তিনি দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন। লাভের টাকা দিয়ে কিছু জমি ক্রয় করেছেন, থাকার জন্য আধাপাকা একটি বাড়ি, বাথরুম, ঘরের বিভিন্ন আসবাবপত্র তৈরি করেছেন, তাছাড়া দুই ছেলেমেয়ের মধ্যে এক মেয়ে ৮ম শ্রেণি পাশ করে নবম শ্রেণিতে পড়ছে এবং ছেলে ৫ম শ্রেণিতে পড়ছে। তাছাড়া তার একমাত্র ননদকে ধুমধামের সাথে বিবাহ দিয়েছেন এবং তারা সুখেই আছে।

স্বামীর নিকট তথা সংসার, পরিবার ও সমাজের অন্য দশজন ছোনিয়ার মতামতের মূল্যায়ন করে। সমাজে ছোনিয়ার একটা সম্মানজনক অবস্থান তৈরি হয়েছে।

বর্তমানে অস্বচ্ছলতা বলতে যা বোঝায় তা ছোনিয়ার সংসারে নেই। ছোনিয়ার দেখাদেখি আরও কয়েকজন এই কাঁকড়ার খামার শুরু করেছে। ছোনিয়া বেগম দরিদ্রতার শিকল থেকে মুক্ত হয়ে একজন স্বাবলম্বী নারী হিসেবে সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি গর্ব করে বলেন, সমাজে সবার কাছে এখন আমি সম্মান ও মর্যাদা পাই যা কখনো কল্পনাই করতে পারিনি।

২৫ মার্চ ২০২৩, দি নিউ নেশন পত্রিকায় প্রকাশিত

দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন ছোনিয়া। তার ব্যবসার লাভের টাকা দিয়ে কিছু জমি ক্রয় করেছেন, থাকার জন্য আধাপাকা একটি বাড়ি, বাথরুম, ঘরের বিভিন্ন আসবাবপত্র তৈরি করেছেন, তাছাড়া দুই ছেলেমেয়ের মধ্যে এক মেয়ে ৮ম শ্রেণি পাশ করে নবম শ্রেণিতে পড়ছে এবং ছেলে ৫ম শ্রেণিতে পড়ছে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি প্রতিষ্ঠান

ডিএফইডি
ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট

আমাদের কার্যক্রম সমূহ

ঋণ কার্যক্রম

- গ্রামীণ ও নগর ক্ষুদ্রঋণ
- উদ্যোক্তা উন্নয়নে ঋণ
- বিশেষায়িত কৃষি ঋণ
- অতিদরিদ্রদের জন্য ঋণ
- ইসলামিক মাইক্রোফিন্যান্স
- WASH

সঞ্চয় কার্যক্রম

- সাধারণ সঞ্চয়
- মেয়াদী সঞ্চয়
- বিশেষ সঞ্চয়

প্রকল্প ভিত্তিক কার্যক্রম

- ENRICH
- Beggar Rehabilitation
- SDL
- BD WASH
- ROJGAR
- Value chain Development
- MDP
- Probin Project
- LRL Project
- SHOUHARDO-III plus
- BAIDA

এজেন্ট ব্যাংকিং

- বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে হিসাব খোলা
- নগদ জমা গ্রহন ও প্রদান
- বৈদেশিক রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান
- ফান্ড ট্রান্সফার
- ব্যালেন্স অনুসন্ধান
- মিনি স্টেটমেন্ট ইস্যু
- ডিপিএস সেবা প্রদান

ডিএফইডি ট্রেনিং সেন্টার (ডিটিসি)

ট্রেনিং রুম

গেস্ট রুম

ট্রেনিং রুম

ডাইনিং রুম

সুবিধাসমূহ

- মনোরম পরিবেশ ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রশিক্ষণ ভেন্যু
- মাল্টিমিডিয়া, ওয়াই-ফাইসহ সবরকমের আধুনিক প্রশিক্ষণ সুবিধা
- এসি ও নন-এসি আবাসিক সুবিধা
- মানসম্মত ডাইনিং সুবিধা
- বিনোদনের সুব্যবস্থা
- বিভিন্ন ট্রেডে অভিজ্ঞ রিসোর্স পার্সন
- সকল ধরণের IT Facility and Support
- পরিবহন সুবিধা
- এছাড়াও রয়েছে Group 4-এর ভত্যাবধানে সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা

প্রধান কার্যালয়
ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)
বাড়ি # ৮৫২, রোড # ১৩, আদাবর
বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, ঢাকা-১২০৭।
মোবাইল: ০১৮১১-৪৮০০০৬,০১৮১১-৪৮০০১১
ই-মেইল: dfed@ahsaniamission.org.bd